তুরস্কের ইসলামপন্থী রাজনীতি ও নকশবন্দী-খালিদী ধারা

স্ভান্তে ই. কর্নেল

গত দুই দশকে বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে উত্থান ঘটেছে তুরস্কের। নাটকীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিণামে বিশ্বের বড় অর্থনীতির জোট জি-২০ ক্লাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তুরস্ক। রেজেব তাইয়েব এরদোগান ও তাঁর জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির (তুর্কি ভাষায় একেপি) হাত ধরে তুরস্ক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে। গত পনের বছর ধরে (এ নিবন্ধটি ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছে) একেপি তুরস্কে এককভাবে সরকার গঠন করেছে, যা অস্থির রাজনীতির তুরস্কের জন্য একটি বিরল ঘটনা।

একেপির শাসনকাল পশ্চিমে প্রশংসিত হয়েছিল এ দৃষ্টিতে যে, একেপির বিজয় মানে আধা-স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিজয়। একেপি উত্তরাধিকার সূত্রে যে তুরস্ক পেয়েছিল, সেই তুরস্ক চলত ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনায়। একেপি ক্ষমতায় এসে তুরস্কের পরিবর্তনে মনোযোগ দিলো। তুরস্ক ধীরে ধীরে ইউরোপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করল এবং নিজেকে সুন্নি ইসলামী চরিত্রের মধ্যপ্রাচ্যের নতুন শক্তি হিসেবে গড়ে তুলল। গত পাঁচ বছরে তুরস্ক অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও অগ্রসরতার স্বাক্ষর রেখেছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামিক ভাবাদর্শকে যুক্ত করা হয়েছে। ২০১৫ সালের জুন মাসে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি এরদোগান তার নির্বাচনী প্রচারণার সময় জনতার সামনে পবিত্র কুরআন প্রদর্শন করেছেন এবং কখনো কখনো বক্তৃতা শুরু করেছেন পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে, যা কয়েক বছর আগেও তুরস্কে কল্পনা করা যেত না।

বর্তমান নিবন্ধটি তুর্কি সরকারের গৃহীত নীতির উপর কোনো গবেষণা নয়, বরং এটি তুর্কি রাজনৈতিক ইসলামে যুক্ত হওয়া ধর্মীয় ও আদর্শিক উপাদানগুলোর উপর একটি অনুসন্ধান। তুর্কি ইসলামপন্থী রাজনীতি, এবং একই সাথে তুর্কি রাজনীতি ক্রমবর্ধমান হারে শক্তিশালী বিভিন্ন ধর্মীয় ধারার (তরিকা) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেগুলো সামগ্রিকভাবে “তরিকত” বা “সিমাত” নামে পরিচিত। এই ধারাগুলোই বর্তমান তুর্কি ক্ষমতার ভিতকে গড়ে দিয়েছে। এদের আদর্শের মধ্যে একটা সাধারণ মিল ছিল এই যে, এরা সবাই নকশবন্দী সুফি ধারার খালিদী শাখার অনুসারী অথবা ওই শাখা থেকে উদ্ভূত। ইসলামের কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা বা দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণেই নকশবন্দী-খালিদী গ্রুপগুলোর উদর থেকে তুর্কি ইসলামী রাজনীতির জন্ম হয়েছে। এভাবে একেপি’র মাধ্যমে আজকের তুরস্কের প্রধান

রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে খালিদী দর্শন। সামান্য অতিরঞ্জনকে আমলে নিয়েও এ কথা বলা যায় যে, তুরস্কের ক্ষমতায় আসীন বর্তমান জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একে পার্টির ইংরেজি নাম) ও এ দলের নেতৃত্বাধীন সরকার তুরস্কের বিভিন্ন ধর্মীয় ধারার একটি জোট মাত্র, যদিও তুর্কি রাজনীতির বিশ্লেষকগণ এ বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে গেছেন। আজকের তুর্কী রাজনীতিতে যে ধর্মীয় শাখাগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধারণা করা হয়, সেগুলোকে অধ্যয়নের পূর্বে তুরস্কের প্রাচীন বিভিন্ন ধর্মীয় ধারা, বিশেষ করে নকশবন্দী-খালিদী ধারার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। বর্তমান নিবন্ধে সেদিকেই আলোকপাত করা হয়েছে।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের সূর্যাস্ত ও তুর্কি প্রজাতন্ত্রের সূর্যোদয়ের সময়ের ধর্মীয় ধারাসমূহ

অটোম্যানদের (উসমানী খেলাফতের) সময় থেকেই তুরস্কের রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের বিভিন্ন ধারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এগুলো ছিল ইসলামের সুফি ধারার বিভিন্ন অংশ বা শাখা, যাকে তুর্কি ভাষায় □তাসাউফ□ বলা হতো। এ ধারায় শিক্ষকদের (মুর্শিদ) কাছ থেকে আধ্যাত্মিক নির্দেশনা লাভের একটি প্রথা ছিল, যা শিক্ষকদের এক অবিচ্ছিন্ন ধারার অংশ, যার সূত্র মহানবি (স) পর্যন্ত পৌঁছায়। বিভিন্ন মুর্শিদ মিলে বড় বড় জমায়েত তৈরি করা হতো। এদের কয়েকটি এমন বৃহৎ ধারায় (তরিকত) পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, এগুলোর বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ থেকে মহাদেশে। পরিণামে এ ধারাগুলো থেকে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন শাখা (কল) তৈরি হলো। আবার শাখাগুলো থেকে তৈরি হলো কিছু আশ্রম (দরগা)। নকশবন্দী ধারা দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সেই বৃহৎ ধারাগুলোর একটি। ইতিহাসের বড় একটা অংশ জুড়ে দেখা গেছে এই নকশবন্দী ধারা ইসলামের প্রসারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক যুগেও এ ধারাগুলোর বিভিন্ন শাখার অস্তিত্ব চোখে পড়ে, যেগুলোকে মৌলিকভাবে সুফি জমায়েত বলা যায় না। এগুলোর প্রকৃতি যতটা আধ্যাত্মিক, তার চাইতে বেশি আধুনিক। নূর আন্দোলন ও এর শাখা ফেতুল্লাহ গুলেন আন্দোলন এক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এ ধারাগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে। উনিশ শতকের পাশ্চাত্য প্রভাবিত সংস্কারের আগে আটোম্যান আমলাতন্ত্র এ ধারাগুলোকে প্রচন্ডভাবে দমিয়ে রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে সেসময় তারা সরাসরি কোনো রাজনৈতিক ভূমিকাই পালন করতে পারেনি। অটোম্যান যুগের শেষের দিকে এসে গৃহীত পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতির কারণে এ ধারাগুলো বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তুরস্কে গণতন্ত্র চালুর প্রথম দিকে এ ধারাগুলো সুপরিকল্পিতভাবে দমন-পীড়নের শিকার হতে থাকল। ১৯৫০ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সময়ে এরা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক মঞ্চে পুনরায় আবির্ভূত হতে থাকল এবং অবশেষে ২০০২ সালে তুরস্কের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো, যা আজও চলমান।

ভিয়েনায় অটোম্যানদের পরাজয় এবং এরপর পশ্চিমা শক্তির কাছে সামরিক আত্মসমর্পণের সময় থেকেই তুরস্কে ধর্মীয় ধারাগুলোর এ জোয়ার-ভাটা কার্যকর ছিল। এটি ছিল এমন এক নবায়ন ও সংস্কার প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সমাজ থেকে ধর্মীয় প্রভাবশালী শক্তি □উলেমা□দের প্রভাব ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছিল। পরিহাসের বিষয় হলো, এ থেকে লাভবান হয়েছে ঐতিহ্যবাদী নকশবন্দী ধারা। কারণ ১৮২৬ সালে জেনিসারি বাহিনী ধ্বংসের সাথে সাথে আমলাতন্ত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখা আধুনিক □বেকতাশি□

ধারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমলাতন্ত্র ও অটোম্যানদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে প্রভাব বিস্তারকারী বেকতাশি ধারার শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসে নকশবন্দী-খালিদী ধারা।

একইসাথে পশ্চিমা ধাঁচের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধিক্য ইসলামী ধাঁচের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করল। এ ধর্মনিরপেক্ষকরণ (সেকুলারাইজেশন) প্রক্রিয়া একদিকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের উপর উলেমাদের প্রভাবকে হুমকির মুখে ফেলে দিলো, অন্যদিকে ধর্মীয় ধারাগুলোকে পশ্চিমা ধাঁচের সংস্কারের আদর্শিক প্রতিপক্ষে পরিণত করে ফেলল।

বেকতাশি ধারা বিলুপ্ত হয়ে গেলে নকশবন্দী ধারার খালিদী উপধারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। খালিদী নামটি এসেছে খালিদ আল বাগদাদীর নাম থেকে। উনিশ শতকের গোঁড়ার দিকে বাগদাদীর হাতে এ ধারাটি যাত্রা শুরু করেছিল। বাগদাদীর বিপুল পরিমাণ শিষ্য ছিল, সংখ্যাটি সব মিলিয়ে ১১৬ হবে। এ শিষ্যরা খালিদী ধারার শিক্ষা প্রচার করতে শুধু অটোম্যান সাম্রাজ্য জুড়ে নয়, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তানসহ আটোম্যান সাম্রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল। তুর্কি সমাজ ও রাজনীতিতে এ ধারার প্রভাব অনুমানের চাইতেও অনেক প্রবল হয়ে দেখা দিলো। এদের চিন্তাধারার বাই প্রোডাক্ট হিসেবে গোড়াপত্তন হলো অসংখ্য আন্দোলনের। কার্যত আজকের তুরস্কের সকল রাজনীতি সংশ্লিষ্ট সামাজিক আন্দোলন খালিদী ধারার চিন্তারই ফসল। শুধু তাই নয়, আজকের তুরস্কের প্রায় সকল ধর্মীয় ধারা ও গোষ্ঠী খালিদী ধারা থেকেই এসেছে। এদের মধ্যে সবচাইতে সুপরিচিত হলো ইস্তাম্বুলের ইস্কান্দার পাশা দরগা, যেখান থেকে ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জন্ম লাভ করেছে “মিল্লি গুরুস” আন্দোলন বা “ন্যাশনাল আউটলুক” আন্দোলন। এ আন্দোলন থেকেই তুরস্কে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যার নেতৃত্বে ছিলেন নাজিমুদ্দিন এরবাকান। কিন্তু অন্য আরও কিছু গ্রুপ, যেমন মেনজিল, নুরজু (ফেতুল্লাহ গুলেন গোষ্ঠীসহ), সুলেইমানজি ও ইশিকচি গ্রুপগুলোও এ ধারার সাথে যুক্ত হয়েছে।

গত শতকের অটোম্যান সাম্রাজ্যে ধর্মীয় ধারাগুলো যখন দেখতে পেল রাজনীতি ও প্রশাসনে তাদের প্রভাব শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে, তখন তারা প্রধানত সামাজিক জীবনে তাদের প্রভাব ধরে রাখার দিকে মনোযোগ দিলো। সেই সময় সমাজে দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। একদিকে ছিল আধুনিক স্কুল, অন্যদিকে ছিল ধর্মীয় মাদরাসা। এ অবস্থা ধর্মীয় ধারাগুলোকে শিক্ষাখাতে ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিলো। কিন্তু ১৯২৩ সালে তুর্কি প্রজাতন্ত্র জন্মের পর সালতানাত ও খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে গেল। ১৯২৪ সালে “ল অন ইউনিফিকেশন অব এডুকেশন” (তেভহিদ-ই-তেদরিসাত কানুনু বা শিক্ষাব্যবস্থা একীভূতকরণ আইন) প্রণয়ন করে দেশের সকল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হলো। ১৯২৫ সালে নকশবন্দী ধারার একজন শাইখ, শাইখ সাঈদ নেতৃত্বে তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে সরকারের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ফলে ওই বছর একটি আইন প্রণয়ন করে তুরস্কের সকল ধর্মীয় ধারা, আশ্রম ও দরগার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হলো। ফলে সকল ধর্মীয় ধারার আর কোনো আইনগত স্বীকৃতি থাকল না। অধিকন্তু ১৯২৭ সালে যখন তুর্কি ভাষা থেকে আরবী অক্ষর পরিত্যাগ করে ল্যাটিন অক্ষর চালু করা হলো, তখন রাষ্ট্রের চরিত্র ও বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থার উপর থেকে ধর্মীয় ধারাগুলোর প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে গেল। এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। আতাতুর্ক ও তার অনুসারীরা প্রকাশ্যেই ধর্মীয় ধারাগুলো ও এগুলোর অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করতে চাইতেন।

স্বাভাবিকভাবেই এ মৌলবাদী বিপ্লবী ধর্মনিরপেক্ষ পদক্ষেপ জনগণের মধ্যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ধর্মীয় গ্রুপগুলো আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বাধ্য হলো। বিশেষ করে দেশের পূর্বাঞ্চলে, যেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল ছিল, সেখানে নকশবন্দীর অনুসারীরা গোপনে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকল। ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ থাকায় বহু ছাত্র ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতে তুরস্ক ছেড়ে কায়রো, বাগদাদ, দামেস্ক বা মদিনার মতো শহরগুলোর ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে গেল। এ ছাত্রদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তুরস্কে ফেরার সময় সাথে নিয়ে এলো সালাফি ইসলামের চিন্তাধারা এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের মতাদর্শ। আরব বিশ্বের মতো না হলেও এর প্রায় কাছাকাছি কট্টর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি শীঘ্রই তুরস্কে দানা বেধে উঠল এবং এর প্রতিফলন দেখা গেল তুরস্কের রাজনৈতিক মঞ্চে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো- তুরস্কের নকশবন্দী-খালিদি ধারার সুফি অবস্থান সত্ত্বেও এ ধারার সাথে নতুন ধারাগুলোর মিশ্রণ ঘটতে থাকল। বাস্তবে দেখা গেল, নকশবন্দী ধারার রক্ষণশীলতা ও রাজনৈতিক অবস্থান সালাফী-ব্রাদারহুড প্রভাবিত ভাবাদর্শকে শত্রু নয় বরং মিত্র হিসেবে গ্রহণ করল।

আতাতুর্কের সময় গৃহীত কঠোর ধর্মনিরপেক্ষ নীতি, যার প্রকৃতিকে জ্যাকোবাইন হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো, তা তার জীবদ্দশার পরে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এমনকি ১৯৩৮ সালে আতাতুর্কের মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে ১৯৫০ সালে তুরস্কে গণতন্ত্র চালু হওয়া পর্যন্ত সময়ে ধর্মীয় গ্রুপগুলোর উপরে চাপ অনেকটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার সাথে সাথে ক্ষমতার প্রশ্নে ধর্মনিরপেক্ষতা তার একচেটিয়া আধিপত্য হারিয়ে ফেলল। তুর্কি রাষ্ট্র দ্রুত সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিলো। দেশজুড়ে স্বেচ্ছাসেবী ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল দুর্বল, অন্যদিকে শীর্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর গোড়াপত্তন ঘটেছিল ইসলামপন্থীদের হাত ধরে, কখনও কখনও যাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বামপন্থী দলগুলো বা ট্রেড ইউনিয়নগুলো। তার উপর, সোভিয়েত আগ্রাসনের শঙ্কায় ১৯৫০ এর দশক থেকে শুরু করে তুরস্ক রাষ্ট্রটি কমিউনিজম থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে ক্রমবর্ধমানভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ১৯৮০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের আগ পর্যন্ত এ প্রবণতা কার্যকর ছিল। কিন্তু ১৯৮০ এর দশকের শুরুর দিকে, সামরিক শাসনের সময়, একটি নতুন রাষ্ট্রীয় আদর্শের সূত্রপাত ঘটাতে সুন্নি ইসলাম ও তুর্কি জাতীয়তাবাদ একজোট হলো। শাসক শ্রেণীর অভিজাতরা ধর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করে যাচ্ছিল। কিন্তু ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মপ্রাণ সমাজের উপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই শূন্যের কোঠায় নেমে গেল।

১৯৫০ এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামী সংগঠনগুলো পুনরুজ্জীবিত হয়ে চলেছে। ধর্মীয় নেতৃত্বের অভাব ঘোচাতে এসময় রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছিল। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এ প্রতিষ্ঠানগুলোর সমান্তরালে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে আবার প্রকাশ্যে আসতে শুরু করল ধর্মীয় ধারাগুলো। এ যুগেই মূলত নুরজু, সুলেইমানজি ও ইশিকচি -এর মতো ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো দৃশ্যমান হলো।

নকশবন্দী-খালিদী ধারা ও ইস্কান্দরপাশা দরগা

ঐতিহ্যবাদী (অর্থোডক্স) ইসলামের বিপরীতে সুফি ধারা পরিচিত তার বাতেনি প্রকৃতির জন্য। সুফি ধারাকে প্রায়শই এ দৃষ্টিতে দেখা হয় যে, এটি ইসলামের অক্ষরবাদিতা ও শরীয়া আইনের কঠোর ব্যাখ্যার চেয়ে আধ্যাত্মিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু একই উপায়ে নকশবন্দী ধারাকে দেখলে তা সঠিক হবে না। ঐতিহ্যবাদী মূলধারার ইসলামের সাথে সঙ্গতিশীলতার কারণে অন্যান্য সুফি ধারার তুলনায় নকশবন্দী ধারার অবস্থান ভিন্নরকম। প্রকৃতপক্ষে নকশবন্দী ধারা অন্যান্য সুফি ধারা থেকে পৃথক। প্রায় সবগুলো সুফি ধারা তাদের কোনো না কোনো সিলসিলা অনুসরণ করে থাকে। এ সিলসিলা হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একটি ধারা, যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (স) থেকে এবং মহানবি (স) এর পরেই রয়েছে তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা হযরত আলী (রা), যাকে শিয়া মুসলিমরা তাদের প্রথম ইমাম মনে করে থাকে। কিন্তু অন্যান্য সুফিধারার এ সিলসিলার বাইরে গিয়ে নকশবন্দি ধারাই হলো একমাত্র ধারা যেটির আধ্যাত্মিক সিলসিলার শুরুতে মহানবি (স) এর পরেই রয়েছেন প্রথম সুন্নি খলিফা হযরত আবু বকর (রা)। ফলে এটি জোর দিয়ে বলা যায় যে, রক্ষণশীল সুন্নী ইসলাম ও এর কঠোর শরীয়া নীতির সাথে নকশবন্দী ধারার একটি দৃঢ় মেলবন্ধন রয়েছে, যে ধারার আধ্যাত্মিকতাকে বলা যায় ইসলামের আনুষ্ঠানিক দায়িত্বগুলো (ইবাদত-বন্দেগী) পালনের একটি প্রয়াসমাত্র।

নকশবন্দী ধারা বিকাশের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন সতের শতকের শাইখ আহমদ আল সিরহিন্দি (ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম গ্রহণ করা এ সাধককে 'মুজাদ্দিদে আলফে সানি' বা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক বলা হয়)। তিনি নকশবন্দী ধারার ভেতর ঐতিহ্যবাদিতা ও শিয়া-বিরোধিতাকে শক্তিশালী করেছেন এবং 'ইজতিহাদ' (যুক্তির ভিত্তিতে স্বাধীন মত প্রকাশ)-কে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, যাতে তা কুরআন ও সুন্নাহর সীমারেখা অতিক্রম না করে। সিরহিন্দি জনসাধারণ থেকে সরে যাওয়ার পরিবর্তে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে থেকেই সুফি চর্চাকে উদ্বুদ্ধ করতেন। উনিশ শতকে এসে এ চিন্তাধারাকে গ্রহণ করলেন আজকের উত্তর ইরাকের কুর্দি বংশোদ্ভূত শাইখ খালিদ-ই-বাগদাদী, যিনি ১৮০৯ সালে ভারতে নকশবন্দী ধারায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি নতুন একটি ধারার গোড়াপত্তন করেন, যার নাম খালিদী ধারা বা খালিদিয়া। এ ধারাটি সিরহিন্দির মতাদর্শকে শক্তিশালী করে তুলল এবং বিদেশী শাসন বা অনৈসলামিক মতাদর্শকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করল। উত্তর ককেশাস থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এ ধারা দৃঢ় জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হলো। অটোম্যানদের ভূমিতে, ইউরোপের কাছে আত্মসমর্পণের দিনগুলোতে এ ধারা জনগণের কাছে ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। শীঘ্রই অটোম্যান সাম্রাজ্যে খালিদী ধারা অন্যান্য সকল ধারার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করল। ১৮২০ এর দশকে খালিদী ধারা একটি গণশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো। তারা 'সংস্কারের জন্য ইসলামের পুণঃপ্রতিষ্ঠা' ও 'শরীয়ার কঠোর অনুসরণের' জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানালো। তানজিমাত যুগে (আটোম্যান সাম্রাজ্যে ১৮৩৯ সাল থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত সময়ে গৃহীত সংস্কারের যুগ) পশ্চিমা সংস্কার প্রক্রিয়ার যখন জয়জয়কার, তখন খালিদী ধারা নিজেকে শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করল।

এ বিরোধিতার ধারাবাহিতা তুরস্কে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুর পরেও অব্যাহত ছিলো। বাগদাদীর একজন শিষ্য আহমাদ সুলেইমান আল আরওয়াদীকে (মৃত্যু ১৮৫৮) ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করা হয়েছিল। আহমাদ সুলেইমান আল আরওয়াদী সেখানে বিখ্যাত নকশবন্দী আহমেদ জিয়াউদ্দিন গুমুশানেভি-কে (১৮১৩-

১৮৯৩) গড়ে তোলেন, যার প্রতিষ্ঠিত দরগা পরবর্তীতে ইসকান্দারপাশা দরগা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। সম্ভবত গুমুশানেভির একজন উত্তরসূরি ছিলেন তুরস্কের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামপন্থী মেহমেত জাহিত কটকু (১৮৯৭-১৯৮০), যিনি ছিলেন দাগেস্তান থেকে আসা অভিবাসীদের সন্তান। ১৯১৮ সালে তিনি খালিদী ধারায় দীক্ষিত হন এবং ১৯৫২ সালে ইস্তাম্বুলে ইসলাম প্রচারের জন্য ইজাজাহ (দায়িত্বভার গ্রহণ) লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ইস্কান্দারপাশা মসজিদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সে দায়িত্বেই ছিলেন।

এরপরের তিন দশকে কতকু ছিলেন তুরস্কের ইসলামপন্থী রাজনীতির এমন একজন অঘোষিত নেতা, যিনি তুরস্কের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পরিবেশে খালিদী ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কতকু ঔপনিবেশিকতা বিরোধী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি দেশীয় শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে তুরস্ককে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি একদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব ভালোভাবে অনুধাবন করতেন, অন্যদিকে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কঠোর বিরোধিতা করতেন। তিনি মনে করতেন পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণের মাধ্যমে তুর্কিরা তাদের আত্মপরিচয়ের মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলিমদের সমাজ ও রাজনীতির শীর্ষ স্থানগুলো দখল করে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিৎ। কতকুর অনুসারীরা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানগুলো ও আমলাতন্ত্রে সফলভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে গৃহীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি গ্রহণে এবং রাষ্ট্রীয় জনবল নিয়োগে কটকুর অনুসারীরা উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখার সুযোগ পেয়ে যায়।

কতকু ও ইসকান্দারপাশা দরগার ভূমিকাকে বাড়িয়ে বলার সুযোগ নেই। কতকু তার পূর্বসূরি আব্দুল আজিজ বেক্কিনের (১৮৯৫-১৯৫২) কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এ কারণে যে, আব্দুল আজিজ বেক্কিনে নির্বাচনী রাজনীতির সাথে ইসলামকে একাকার করে ফেলতে নিষেধ করেছিলেন। বরং তিনি একটি ধার্মিক মুসলিম প্রজন্মকে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে উৎসাহিত করেছিলেন এবং তুরস্কে ইসলামপন্থী রাজনীতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। তুর্কী বিশেষজ্ঞ বিরল ইয়েসিলাদার মতে, নকশবন্দীরা সবসময় শক্তিশালী পুজিতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক উৎসের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে ভেতর থেকে রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তার উপর গুরুত্ব দিত। আরও সরাসরি বলতে গেলে কতকু অবশেষে তুরস্কের মধ্য-ডান থেকে ইসলামিক শাখার বিভক্তির অনুমোদন দেন এবং ১৯৬৯ সালে নাজিমুদ্দিন এরবাকানকে ন্যাশনাল অর্ডার পার্টি গঠনে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই সময়ের একজন শীর্ষস্থানীয় ইসলামপন্থী বলেছিলেন যে, কতকু এরবাকানকে বলেছেন, দেশ পশ্চিমাদের অনুকরণকারী ফ্রিম্যাশনদের হাতে পড়েছেসরকার যেন আইনী সীমার ভেতর সত্যিকার জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে গঠিত হয়, সে লক্ষ্যে আমাদের অনিবার্য ঐতিহাসিক দায়িত্ব হলো একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা। এ প্রচেষ্টার একটি অংশ হয়ে ওঠো এবং এর নেতৃত্ব দাও। কতকুর শিষ্য ও ইসকান্দারপাশা দরগার সদস্যদের মধ্যে অনেকেই পরে বিখ্যাত রাজনৈতিক পদে আসীন হয়েছিলেন। এদের মধ্যে কেবল এরবাকান ছিলেন না। আরও ছিলেন তার পরবর্তী রাষ্ট্রপতি তুরগুত ওজাল, তার আরও রক্ষণশীল ভাই কোরকুট ওজাল, পরবর্তী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান, তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুলকাদির আকসু, বেসির আতালাই ও

এরদোগানের সময়কার প্রায় এক ডজন মন্ত্রী।

এরবাকানের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের কারণে তার সাথে ইসকান্দারপাশা গোষ্ঠীর সম্পর্ক ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকল। ফলে ইসকান্দারপাশার সদস্যগণ রাজনীতি থেকে সরে আসতে শুরু করলেন। কতকু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এ জনবিচ্ছিন্নতা কার্যকর ছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালে কতকুর মৃত্যুর দুই বছর আগে তৎকালীন ন্যাশনাল স্যালভেশন পার্টির একজন জ্যেষ্ঠ নেতা কোরকুট ওজাল এরবাকান-স্টাইল ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে একটি ছোটখাটো বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তিনি দাবি করেন, তার এ বিদ্রোহের পেছনে কতকুর অনুমোদন রয়েছে। কতকুর মৃত্যুর পর তার গোষ্ঠীর নেতৃত্ব চলে গেল তার জামাতা প্রফেসর এসাদ কোশান এর হাতে। কোশান এরবাকানের কাছ থেকে ইসকান্দারপাশা ধারাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি খুব যত্ন করে এরবাকানের রাজনীতির সাথে ইসকান্দারপাশা ধারার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। অন্যদিকে ইসকান্দারপাশা দরগার নিজস্ব প্রভাবও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছিল। ১৯৯৭ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর কোশান তুরস্ক ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান এবং ২০০১ সালে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারান। তার পরবর্তী উত্তরসূরী হন নূরুদ্দিন কোশান, যিনি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন। যদিও আজ দরগার ধর্মীয় নেতৃত্ব কেবলই অতীত, তবু এর অনুসারীরাই মূলত একেপির নেতৃত্বকে গড়ে দিয়েছিল, যা তুরস্কের রাজনীতিতে দরগার বিশাল প্রভাবের ইঙ্গিতই বহন করে।

নকশবন্দী-খালিদী ধারার শাখাসমূহ

ইসলামপন্থী রাজনীতিকে একটি পৃথক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে ইসকান্দারপাশা রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেও তখনও পর্যন্ত এর সম্ভাবনা পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার বাকি ছিল, কারণ বহু ইসলামিক গোষ্ঠী তখনও ইসকান্দারপাশার সাথে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। কাজেই তুরস্কের ইসলামপন্থী রাজনীতির বিবর্তনকে অধ্যয়ন করার আগে নকশবন্দী-খালিদী ধারার বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক, যাদের মোট সদস্য সংখ্যা ইসকান্দারপাশার চাইতে অনেক বেশি।

নুরজু বা সাঈদ নুরসির আন্দোলন

নুরসির গোষ্ঠী নিজেদের কোনো ধর্মীয় ধারা নয়, বরং একটি তাফসির (ব্যাখ্যা) পাঠশালা হিসেবে বিবেচনা করত। এটি বিশ শতকের গোঁড়ার দিকে সাঈদ নুরসির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব তুরস্কের কুর্দি প্রভাবিত এলাকায় জন্মগ্রহণ করা নুরসি ছিলেন একজন ধর্ম প্রচারক। যদিও নুরসির নিজস্ব চিন্তাধারা ছিল, তবু তার প্রথম দিকের চিন্তাধারা ছিল নকশবন্দী-খালিদী ধারার শাইখদের দ্বারা প্রভাবিত, যাদের মাদরাসায় তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি নকশবন্দী-খালিদী ধারায় আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত হন এবং অবশেষে দোগুবেয়াজিতে তিনি একজন খালিদী শাইখের কাছ থেকে ইজাজাহ লাভ করেন।

নুরসির লক্ষ্য ছিল পূর্ব তুরস্কের ভান এলাকায় এমন একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে তিনি প্রথমে ইস্তাম্বুল যান, পরে সালোনিকায় (আজকের গ্রীসের থেসালোনিকি) যান এবং কমিটি ফর ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেসে যোগ দেন। এরপর থেকে ফেতুল্লাহ গুলেনের বৈশ্বিক আন্দোলনসহ সকল নুরজু (নুরজু মানে হলো- আলোর অনুসারী। তুর্কি ভাষায় নুর অর্থ আলো) গোষ্ঠী একই স্বপ্ন দেখত। তারা এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখত, যারা হবে ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষায় সমানভাবে শিক্ষিত, যাতে করে মুসলিম বিশ্বের সাথে বস্তুগতভাবে উন্নত পশ্চিমা বিশ্বের ব্যবধানকে কমিয়ে আনা যায়।

যদিও নুরসি প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের প্রথম দিকে নির্যাতিত ও নির্বাসিত হয়েছিলেন, তবুও ১৯৬০ এর দশকে ডেমোক্রেটিক পার্টির শাসনকালে তিনি তার সংগ্রামকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিলেন। নুরসির ছাত্ররা পরবর্তীতে সমগ্র তুরস্কজুড়ে ছড়িয়ে পড়েন এবং নুরসির লিখিত বহু খণ্ডের কুরআনের তাফসির রিসালা-ই নুর এর পাঠচক্র চালু করেন। নুরসির লেখা ছিল বিশেষভাবে তার সংগঠনের জন্য। কুরআনের সূরাগুলো যেভাবে লম্বা সূরা থেকে ছোটো সূরার ক্রমে সাজানো, নুরসির লেখা তেমন ছিল না, বরং তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে তার লেখা সাজিয়েছিলেন। কিন্তু নুরসির মৃত্যুর পর তার আন্দোলন ওকুইউকুলার (পাঠক) ও ইয়াজিকিলার (লেখক) এই দুই উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়, যে বিভক্তির সূত্রপাত ঘটেছিল রিসালা শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে। বিভিন্ন কারণে নুরসির আন্দোলনে আরও কিছু বিভক্তির ঘটনা ঘটেছিল। আজ তুরস্ক ও তুরস্কের বাইরে প্রায় ৪টি নুরজু গ্রুপ আছে, যাদের মধ্যে এক ডজন গ্রুপ এখনও প্রভাবশালী। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ হলো গুলেন গ্রুপ।

নুরসি গোষ্ঠীর উত্থান ঘটেছিল সিভিল সোসাইটির বেশে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময়ে এমনকি তা-ও নিষিদ্ধ ছিল। তুরগুত ওজাল যখন ক্ষমতায়, যিনি নিজেই ছিলেন একজন নকশবন্দী-খালিদী ধারার অনুসারী, তখন তুর্কি দণ্ডবিধির ১৬৩ ধারা পরিবর্তন করে শরীয়ার প্রচারকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। এ আইনকে ব্যবহার করে মূলত তুরস্কের অধিকাংশ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। আইনটি অপসারণের ফলস্বরূপ নুরজু গ্রুপগুলো তাদের সদস্যদের বাড়িতে অথবা সোহবতে স্টাডি সার্কেলগুলো আবার চালু করতে শুরু করল। ফাউন্ডেশন, অ্যাসোসিয়েশন ও ইয়ার্ট বা ছাত্রাবাসগুলোতে তারা আবার সংগঠিত হতে থাকল। এভাবে অনানুষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষার একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি হলো। সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সুসংগঠিত ও সুবিস্তৃত আন্দোলন ছিল নুরজু আন্দোলন। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, নুরসি গোষ্ঠীর আন্দোলন সরাসরি দলীয় রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখলেও একেপির জন্মের আগ পর্যন্ত তারা ইসলামপন্থী নাজিমুদ্দিন এরবাকানের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ মধ্য-ডানপন্থী দলগুলোকে সমর্থন করত।

ফেতুল্লাহ গুলেন আন্দোলন

যদিও ফেতুল্লাহ গুলেন আন্দোলন ছিল নুরকু গ্রুপেরই একটি সংস্করণ, তবু এর আয়তন ও প্রভাবের কারণে এটি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। ফেতুল্লাহ গুলেন হলেন এমন একজন বিখ্যাত ধর্মীয়

ব্যক্তিত্ব, যার উত্থান ঘটেছিল নুরজু আন্দোলন থেকে। তিনি ১৯৬০ এর দশকে ইজমিরে তার কার্যক্রম শুরু করলেন। সেই সময়ে কয়েক দশক ধরে গৃহীত রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে তুরস্কে একটি ধর্মীয় শূন্যতা বিরাজ করছিল। তখন তুরস্কে ধীরে ধীরে ইসলামের জন্য অনুকূল পরিবেশের দরজা উন্মুক্ত হচ্ছিল। এ পরিস্থিতির ফসল ঘরে তুললেন গুলেন। গুলেনের আন্দোলনকে বলা হতো হিজমেত আন্দোলন, যার আক্ষরিক অর্থ □সেবা□। এ পরিভাষাটি নেওয়া হয়েছে সাঈদ নুরসির প্রত্যয় □হিজমেত-ই-ঈমানিয়ে ভে কুরআনিয়ে□ বা □ইমান ও কুরআনের সেবা□ থেকে। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে একটি □সোনালী প্রজন্ম□ গড়ে তোলা। ইতোমধ্যে এ আন্দোলনের প্রথম প্রকাশনা □সিজিনতি ম্যাগাজিনে□ গুলেন তার অনুসারীদের শিক্ষাখাতে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। □ইসিক ইভেলরি□ বা বেসরকারি ছাত্রাবাসগুলো ছিল এ আন্দোলনের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ছাত্রাবাসগুলোতে আনুষ্ঠানিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হতো। ১৯৮২ সালে ওজাল যখন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন করলেন, তখন গুলেন ইজমিরের একটি ছাত্রাবাসকে তার প্রথম বিদ্যালয় (স্কুল) বানিয়ে ফেললেন, যেটির নাম ছিল □ইয়ামানলর কোলেজি□।

সময়ের সাথে সাথে এরকম বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। এ বিদ্যালয়গুলো বিশেষভাবে রক্ষণশীল ও মধ্য-ডানপন্থী অভিজাত পরিবারের শিশুদের কাছে ছিল আকর্ষণীয়, যারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ও সাংস্কৃতিকভাবে রক্ষণশীল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে আরও উন্নত শিক্ষার সন্ধান করত। ১৯৯০ এর দশকের শুরুর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে সদ্য স্বাধীনতা লাভকারী তুর্কি ভাষা-ভাষী রাষ্ট্রগুলোতে এ মডেলের শিক্ষা ব্যবস্থা রফতানির সুযোগ তৈরি হলো। এ দেশগুলোর মধ্যে প্রথম ছিল আজারবাইজান, দ্বিতীয় দেশ ছিল কাজাখস্তান, যেখানে হিজমেত আন্দোলন দ্রুততম সময়ে ২৯টি বিদ্যালয় গড়ে তুলল। আজ হিজমেত আন্দোলন দুনিয়ার ১৪০টি দেশে ১,২০০টি চমকপ্রদ বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। বিদ্যালয় ছাড়াও এ আন্দোলন তুরস্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিমূলক কোর্স পরিচালনা করেছে। এছাড়াও তৈরি করেছে ইস্তাম্বুলের ফাতিহ ইউনিভার্সিটিসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। এ আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বেশ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন- ব্যাংক এশিয়া, এশিয়া ফাইন্যান্স, বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টুসকন (TUSKON) এবং তুরস্কের ভেতরে ও বাইরে পরিচালিত বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও এ আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তুরস্কের উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু গণমাধ্যম। এর মধ্যে রয়েছে তুরস্কের বৃহত্তম সার্কুলেশনের সংবাদপত্র- জামানসহ আরও কিছু সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, টেলিভিশন ও রেডিও স্টেশন। ফেতুল্লাহ গুলেনের অনেক ধর্মপ্রাণ অনুসারী, যারা ইসলামপন্থী রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করত, তারা উদার গণতন্ত্রের (লিবারেল ডেমোক্রেসি) সাথে ইসলামের সাযুজ্যতাকে গ্রহণ করে নিলো। প্রকৃতপক্ষে তাদের অনেকের মতে ইসলাম উদার গণতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আরও কিছু কারণে তুরস্কের অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর তুলনায় হিজমেত আন্দোলন ছিল আলাদা। সাধারণত তারা পশ্চিমাপন্থী জীবনদর্শনকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। গুলেন নিজে ও তার সহচরেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আত্মনির্বাসনে রয়েছেন। আন্তর্জাতিক বিষয়ে গুলেনের অবস্থান ছিল অন্যান্য ধর্মীয় ধারা থেকে একেবারে আলাদা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুলেনের অনুসারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন অন্যান্য ইসলামী ধারাগুলোর প্রায় কাছাকাছি হলেও পশ্চিমাদের সম্পর্কে গুলেনের অনুসারীদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের চাইতে ছিল ভিন্ন। তারা সাধারণভাবে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপন্থী (প্রো আমেরিকান) এবং তারা

ইউরোপীয় ইউনিয়নে তুরস্কের যুক্ত হওয়াকে সমর্থন করত। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে গুলেন আন্দোলন ছিল নকশবন্দী-খালিদী আন্দোলনের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন।

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনী রাজনীতি থেকে হিজমেত আন্দোলন নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখত। এর পরিবর্তে তারা রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রে নিজেদের উপস্থিতি বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করেছিল। এক্ষেত্রে হিজমেত আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পরবর্তীতে এরদোগানের সাফল্যের পেছনের প্রধান নিয়ামক হয়ে ওঠে, যদিও অবশেষে এটি আবার এরদোগানের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়।

সুলেইমানি ধারা

১৯২৫ সালে ধর্মীয় শিক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর সুলেইমান হিলমি তুনাহানের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ ছোট ছোট গ্রুপ ও ব্যক্তি পর্যায়ে কুরআনে শিক্ষা প্রচারের সংকল্প করল। তুনাহান নিজে নকশবন্দী-খালিদী ধারা থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এ আন্দোলন পরবর্তীতে সুলেইমানজি নামে পরিচিত হয়ে উঠল। এটির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল কুরআনের শিক্ষা প্রসার করা ও মসজিদগুলোকে চালু রাখা। যেসব এলাকায় সরকার থেকে সব মসজিদের জন্য ইমাম নিযুক্ত করা ছিল না, সেসব এলাকায় মসজিদ চালু রাখতে সুলেইমানজি আন্দোলন থেকে ইমাম প্রেরণ করা হতো। ১৯৪৭ সালে যখন কুরআন কোর্স পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হলো, তখন এ আন্দোলনের ছাত্ররা সমগ্র তুরস্ক জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। আজ আন্দোলনটি তুরস্ক ও ইউরোপের সবচেয়ে বড় ও সুসংগঠিত আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। শুধু জার্মানিতে এ আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কয়েক শ মসজিদ ও কুরআনিক স্কুল।

১৯৫৯ সালে তুনাহানের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার জামাতা কামাল কাচার, যিনি কুরআন কোর্স ও ছাত্রাবাসগুলো প্রসারের প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিতে থাকেন। সুলেইমান ডেমিরেলের জাস্টিস পার্টির সহায়তায় এ আন্দোলন অগ্রসর হতে থাকে, যার মাধ্যমে কাচার তিন মেয়াদে সংসদ সদস্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০০ সালে কাচারের মৃত্যুর পর তুনহানের অন্য একটি কন্যার ঘরের দুই নাতি; দুই ভাই আহমেদ দেনিজোলগুন ও মেহমেত দেনিজোলগুনের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব দেখা গেল। ফলে তা আন্দোলনের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করলেও তারা রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাননি। দুই ভাই দুটি ভিন্ন দলের সমর্থকে পরিণত হন। মেহমেত একেপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে আবির্ভূত হন। অন্যদিকে আহমেত যার হাতে ছিল আন্দোলনের অধিকাংশ সমর্থকের নিয়ন্ত্রণ, তিনি রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিমুখ পরিবর্তন করেন। ১৯৯৫ সালে ওয়েলফেয়ার পার্টির টিকিটে সংসদ সদস্য হওয়া আহমেত ১৯৯৭ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর নিজ দল পরিত্যাগ করেন। ১৯৯৮ সালে মেসুত ইলমাজের সরকারে মাদারল্যান্ড পার্টির (ANAP) পক্ষ থেকে তিনি যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৯ ও ২০০২ সালে সুলেইমানজি আন্দোলন সংকুচিত হতে থাকা মাদারল্যান্ড পার্টিকে সমর্থন দেয়। ২০০৭ সালে আহমেত দেনিজোলগুন দুর্ভাগা ডেমোক্রেটিক পার্টির হয়ে লড়েন। ২০১১ ও ২০১৫ সালে আহমেতের ব্লক সমর্থন দিয়েছিল ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট পার্টিকে (MHP)। ২০১১ সালে আহমেত ব্লকের সমর্থন না পেলে ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট পার্টি শতকরা ১০ ভাগ ভোট প্রাপ্তির বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করতে পারত না। এভাবে এ আন্দোলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ কারণে

যে, এটি কখনও একেপিকে সমর্থন দেয়নি।

মেনজিল ধারা

মেনজিল হলো একটি নকশবন্দী-খালিদী গোষ্ঠী, যেটি মূলত ছিল আদিয়ামানভিত্তিক, যদিও পরে খুব দ্রুত এটির শাখা স্থাপিত হয় আংকারা ও ইস্তাম্বুলে। ১৯৮০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর এটি খুব দ্রুত বিকাশ লাভ করা শুরু করে। এর একটি অন্যতম কারণ ছিল এই যে, এটি ছিল এমন একটি ধর্মীয় ধারা যা সেসময়ের রাষ্ট্রকে সমর্থন করত। ফলে দেশের দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মীয় ধারা হিসেবে এটি পশ্চিম তুরস্কে ছড়িয়ে পড়ে। একেপির জন্মের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতো, এটিও মধ্য-ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে সমর্থন করত। প্রকৃতপক্ষে বহু সাবেক ডানপন্থী রাজনৈতিক কর্মী, যাদের মৃত্যুদণ্ডের সাজা মওকুফ করা হয়েছিল, সামরিক অভ্যুত্থানের পর তারা মেনজিল ধারায় যোগদান করে। তার উপর ন্যাশনাল ইউনিটি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুহসিন ইয়াজিসিওলু ছিলেন এ ধারার কাছের মানুষ। একেপি সরকারের অন্তত দুইজন মন্ত্রী মেনজিলের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এরা হলেন জ্বালানী মন্ত্রী তানের ইলদিজ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী রিসেপ আকদাগ। ২০০৫ সালে মেনজিল থেকে TÜMSIAD নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। মেনজিলের একটি দলিল থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক TÜMSIAD ১৫,০০০ সদস্য নিয়ে গর্ব করত এবং TÜMSIAD এর একজন নেতা হাসান সার্ট একেপির সদস্য হিসেবে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এরবাকান থেকে এরদোগান পর্যন্ত সময়ে তুরস্কের রাজনীতিতে ধর্মীয় ধারাসমূহ

তুরস্কের ইসলামপন্থী রাজনীতি বিকশিত হযেছে এ ধর্মীয় ধারাগুলোর আন্তঃসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। যেহেতু ধর্মীয় ধারাগুলোর সদস্যদের মোট সংখ্যা অজানা, কারও কারও মতে এ সংখ্যা লাখ লাখ এবং যেহেতু সদস্যরা ভোট দেয় তাদের নেতাদের নির্দেশনা অনুযায়ী, সেহেতু ধর্মীয় ধারাগুলো তুর্কি রাজনীতিতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬০ এর দশক থেকে ১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত নাজিমুদ্দিন এরবাকানের নেতৃত্বাধীন ইসলামী দলগুলো তুরস্কের ধর্মীয় ধারা ও গোষ্ঠীগুলোকে একত্র করার চেষ্টা করেছেন, যাদের অনেকেই মধ্য-ডানপন্থী দলগুলোকে সমর্থন করত। এ দলগুলোর চরিত্র ছিল পশ্চিমাপন্থী, কিন্তু তারা ছিল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ধর্মীয় ভোটারদের কাছে টানার দিকে আগ্রহী।

সংকীর্ণ বুনিয়াদঃ নাজিমুদ্দিন এরবাকান ও মিল্লি গুরুস

নাজিমুদ্দিন এরবাকান ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি শাইখ কতকুর আদর্শ অনুধাবন করতে পারতেন। ১৯২৬ সালে সিনোপে জন্মগ্রহণ করা এরবাকান জার্মানি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়তে এরবাকান ১৯৬৯ সালের সংসদ নির্বাচনে মধ্য-ডানপন্থী জাস্টিস

পার্টির তালিকার একটি স্লট জয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু এরবাকানের একসময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী জাস্টিস পার্টির নেতা সুলেইমান ডেমিরেল এরবাকানের উদ্যোগের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান। এর মাধ্যমে উদারপন্থী, ইসলামপন্থী ও জাতীয়তাবাদীদের এক ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ রাখা জাস্টিস পার্টির নেতৃত্ব ও পার্টির ইসলামী শাখার ভেতরকার ফাটল দৃশ্যমান হয়। ইসলামপন্থী ও জাতীয়তাবাদীরা ক্রমশই দলের পশ্চিমাপন্থী প্রবণতা ও বৃহৎ বাণিজ্যগোষ্ঠী সাথে সম্পর্কের কারণে গভীর হতাশা অনুভব করে। ফলে ১৯৬৮ সালে ইসলামপন্থীদের দ্বারা দলের কর্তৃত্ব গ্রহণের চেষ্টা নস্যাৎ হওয়ার পর জাস্টিস পার্টির সাথে ইসলামপন্থীদের বিচ্ছেদ ঘটে। একইসাথে জাতীয়তাবাদীদের হাতে তাদের নিজস্ব দল এমএইচপি�র জন্মলাভ হয়।

১৯৬৯ সালের নির্বাচনে এরবাকান একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে জয়লাভ করেন। কতকুর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তিনি তখন ন্যাশনাল অর্ডার পার্টি গঠন করেন। এ পার্টি বন্ধ হওয়ার পর তিনি ন্যাশনাল স্যালভেশন পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এ দলটি ১৯৭০ এর দশকে তুর্কি রাজনীতিতে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে এ পার্টি প্রায় ১২ শতাংশ ভোট লাভ করে এবং ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সময়ে দলটি বিভিন্ন জোট সরকারের কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ১৯৮০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পরিণামে এরবাকানকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৯৮৭ সালে তিনি পুনরায় ওয়েলফেয়ার পার্টির নামে ইসলামপন্থী রাজনীতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে শুরু করেন, যে দলটি ১৯৯৫ সালে মধ্য-ডানপন্থী পার্টির সামান্য বিভক্তির সুযোগে তুরস্কের বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সময়ে এরবাকান জোট সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের পর তিনি ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়লেন। এর পরিণামে এরবাকানের দল নিষিদ্ধ হয় এবং তিনি নিজে রাজনীতি থেকে চিরতরে নিষিদ্ধ হন।

এরবাকানের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং খালিদী ধারার শিক্ষা ও মুসলিম ব্রাদারহুডের দুনিয়াব্যাপী রাজনৈতিক ইসলামী আন্দোলন থেকে অনুপ্রাণিত। একটি শক্তিশালী ও শিল্পোন্নত তুরস্ক গড়ার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার দিকে এরবাকানের আন্দোলন মানুষকে আহ্বান জানাত। এরবাকান একদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানের কথা শুধু স্বীকারই করতেন না, বরং তিনি এই বলে যুক্তি দিতেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান ইসলামী জ্ঞানের ভিত্তিতে বিকশিত হয়েছে, অন্যদিকে তিনি পশ্চিমা সংস্কৃতির তীব্র বিরোধিতা করতেন। এছাড়াও এরবাকান আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে দেখতেন ঔপনিবেশবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- তুরস্ক ও মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমাদের দ্বারা নির্যাতিত, যা এক অর্থে বৈশ্বিক জায়োনিস্ট ষড়যন্ত্রের একটি অংশ। এরবাকান বিশ্বাস করতেন- তুরস্কের নিজস্ব ভারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন, পশ্চিমারা পদে পদে যার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই পশ্চিমাদের সাথে জোট করার পরিবর্তে তুরস্কের উচিৎ মুসলিম বিশ্বের সাথে একজোট হয়ে একটি ইউনিয়ন তৈরি করা।

এরবাকান ছিলেন একজন বিভক্ত ব্যক্তি। রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করার সময় তিনি নুরজু ও কাদিরী ধারার সাথে জোট করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিত্বের কারণে ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এটি ভেঙ্গে যায়। অবশেষে ইসকান্দারপাশা গোষ্ঠীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

এরবাকানের আন্দোলন ছেড়ে চলে যান। তারা ভিন্নভাবে চিন্তা করছিলেন, ফলে তারা তুরস্কের মধ্য-ডানপন্থী দলগুলোকে সমর্থন দেয়। এ দলত্যাগ থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় ১৯৯০ এর দশকে তুরগুত ওজাল ও পরে মেসুত ইলমাজের নেতৃত্বাধীন এএনএপি এবং সুলেইমান ডেমিরেল ও পরে তানসু চিলারের নেতৃত্বাধীন ট্রু পাথ পার্টি (ডিওয়াইপি)। এরবাকান ও মিল্লি গুরুস পার্টির প্রতি বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিমুখতা এত গভীর ছিল যে, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে ১৯৯০ এর দশকে যখন দুটি মধ্য-ডানপন্থী দল ভেঙ্গে গেল, তখন ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে বহু ধর্মীয় গ্রুপ মধ্য-বামপন্থী নেতা বুলেন্ট ইজেভিত ও তার ডেমোক্রেটিক লেফট পার্টি কিংবা এমএইচপি-কে সমর্থন দেয়।

ধর্মীয় ধারাগুলোর জোট: এরদোগানের একেপি

ধর্মীয় ধারাগুলোর বিভক্তির অবসান ঘটল একেপি গঠনের মধ্য দিয়ে। যদিও নবগঠিত দলের নেতা এরদোগান ও আব্দুল্লাহ গুল ছিলেন ইসকান্দারপাশার সদস্য, তবু তারা এরবাকানের নেতৃত্বের ধরণ ও আপসহীন চরিত্রের কারণে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হলো, তারা অনুভব করেন, ক্ষমতায় যেতে হলে ও তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ এস্টাবলিশমেন্টকে পরাজিত করতে হলে, তাদের আন্দোলনকে আরও বড় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। এছাড়াও সদ্যজাত শিশু একেপি আরও কিছু ঘটনা থেকে সুবিধা লাভ করল। প্রথমত, তুরস্কের মধ্য-ডানপন্থী দল দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল- ডিওয়াইপি ও এএনএপি; যাদের কর্মসূচি ছিল কার্যত অভিন্ন কিন্তু এদের নেতারা ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। যেহেতু এ দল দুটির নেতৃত্ব ছিল দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত, সেহেতু দল দুটি ধীরে ধীরে একে অপরকে ধ্বংস করতে লাগল। ফলে তুরস্কের রাজনীতির ঐতিহ্যগত কেন্দ্রে একটি শুন্যতা তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ২০০০-২০০১ অর্থবছরের আর্থিক সংকটে তুরস্কের মুদ্রার মূল্যমান প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ নিচে নেমে যায়। ফলে জনগণের মধ্যে ওই দলগুলোর প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা তৈরি হয়। তৃতীয়ত, ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার উপর হামলার পর পশ্চিমা নেতারা বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মডারেট ইসলামকে গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ফলে স্থবির ও অনির্বাচিত ধর্মনিরপেক্ষ এস্টাবলিসমেন্টের বিরুদ্ধে নতুন পরিস্থিতির প্রধান সুবিধাপ্রাপ্ত দল ছিল একেপি।

একেপি সক্রিয় ও সচেতনভাবে একটি বড় ছাতার দল হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে চাইত, যাতে করে মধ্য-ডানপন্থীদের দল সমর্থন করে এমন নির্বাচনী এলাকাগুলো তারা দখল করতে পারে। বিশেষ করে প্রথম দিকে তারা ধর্মকে বিবেচনায় আনে না- এমন ভোটারদেরও কাছে টানার চেষ্টা করত। কিন্তু এসবকিছুর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো- এরদোগানের ক্ষমতার উৎস ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় ধারা ও গোষ্ঠীর জোট। এরদোগানের কৌশল পূর্বের মধ্য-ডানপন্থী দলগুলোর চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন ছিল না, যারা সবসময় ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর সমর্থন পেতে আগ্রহী ছিল। পার্থক্য ছিল এতটুকু যে, এবার অভিজাত মিল্লি গুরুসের অনুসারীরা সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীকে এক ছাতার নিচে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালো। রাষ্ট্রের ভেতর থাকা ধর্মপ্রভাবিত অংশ, বিশেষ করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত লোকদের উপর ধর্মীয় প্রভাবের বিষয়টিকে দক্ষ হাতে কাজে লাগালেন এরদোগান। তিনি এমন একটি রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তুললেন, যা শক্তিশালীভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় ধারা ও গোষ্ঠীর উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল ছিল।

মিল্লি গুরুস, নকশবন্দী ও মুসলিম ব্রাদারহুড

তুরস্কের রাজনৈতিক মঞ্চে ইসলামপন্থী রাজনীতির জন্ম হয়েছে নকশবন্দী-খালিদী ধারার উদর থেকে। কিন্তু এটি দুনিয়ার অন্য অংশের ইসলামী রাজনীতি, বিশেষ করে মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা মুসলিম ব্রাদারহুডের উত্থানের সাথেও গভীরভাবে সংযুক্ত ছিল। অসংখ্য গবেষক দেখিয়েছেন যে, এরবাকান ও মিল্লি গুরুসের উপর মুসলিম ব্রাদারহুডের চিন্তক হাসান আল বান্না ও সাইয়েদ কুতুব এবং দক্ষিণ এশিয়ায় জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা আল মওদুদীর প্রভাব ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে এটি পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে এ কারণে যে, ইখওয়ানের ঝোঁকপ্রবণতা ছিল বহুভাবে সালাফি ইসলামের সাথে, যা সুফি ধারা ও সুফি ধারার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিরোধী ছিল। কিন্তু সূফিবাদ ও মুসলিম ব্রাদারহুডের এ বৈরিতা নকশবন্দী-খালিদী ধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। খালিদী ধারার গভীর সুন্নী শেকড়, রক্ষণশীলতা ও শরীয়ার সাথে এর গভীর সংযুক্তি এবং আন্দোলনের ব্যাপক রাজনীতিকরণ এ ধারাকে প্রকৃতপক্ষে ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তুলল। মধ্যপ্রাচ্যের বহু অংশে এ দুটি ধারার মধ্যকার সংমিশ্রণ দেখা যায়।

বিশেষ করে জার্মানিতে এ দুটি ধারার সংযুক্ততা দৃশ্যমান হয়, যেখানে ব্রাদারহুড ও মিল্লি গুরুস উভয়ই তদানীন্তন সরকারের মাধ্যমে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয় এবং নিজেদের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে। বিশেষ করে এরবাকান পরিবার ও ব্রাদারহুড নেতা ইবরাহিম আল-জায়াতের পরিবার পরস্পর যুক্ত হয় আন্তঃবিবাহের মাধ্যমে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহযোগিতার মাধ্যমে এ সংগঠন দুটি জার্মান ইসলামী সংগঠনগুলোর উপর প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা পালন করে। এ দৃষ্টিতে একজন গবেষকের ভাষায় এরবাকানকে বলা হতো “তুরস্কে মুসলিম ব্রাদারহুডের একজন গুরুত্বপূর্ণ বাহক”। অন্য একজন গবেষকের ভাষায়, “অন্তর্মুখী জাতীয়তাবাদী ও স্থানীয় ঝোঁকপ্রবণতা সত্ত্বেও তুর্কি ইসলামী চিন্তাধারা বৈশ্বিক ও সার্বজনীন রূপে আবির্ভূত হলো।”এভাবে তুর্কি ইসলামের শেকড়ে এ বোধ ক্রমেই সম্প্রসারিত হলো যে, ইসলাম কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে অনুশীলন করার জন্য সীমাবদ্ধ একটি ধর্ম নয়, বরং গণমানুষের রাজনীতিতে ইসলামের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।”

এরবাকান সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে ব্রাদারহুডের সংগঠনগুলোর সাথে সম্পর্ক তৈরি করেন এবং এরদোগান এ সম্পর্কগুলো এগিয়ে নিয়ে যান। এভাবে ১৯৯০ এর দশকে ব্রাদারহুড দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বকে ওয়েলফেয়ার পার্টির সম্মেলনগুলোতে দৃশ্যমান হতে দেখা গেল। ২০১১ সালে এরবাকানের জানাজার নামাজে মুসলিম ব্রাদারহুডের একদল শীর্ষ নেতা উপস্থিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন হামাস নেতা খালেদ মিশাল ও ব্রাদারহুডের সাবেক নেতা মোহাম্মদ মাহদি আকেফ। একেপির সম্মেলনগুলোতে হামাসসহ ব্রাদারহুডের বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দকে সম্মানিত অতিথি করার দৃশ্য থেকে ব্রাদারহুড ও একেপির মধ্যকার আদর্শগত ঐক্যের বিষয়টি জনসম্মুখে দৃশ্যমান হয়।

মিল্লি গুরুস কখনও মুসলিম ব্রাদারহুডের কোনো অংশ ছিল না। কিন্তু ব্রাদারহুড সবসময় মিল্লি গুরুসকে তার ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বা ব্রাদারহুডের তুরস্ক সংস্করণ হিসেবে দেখত, যেমনটি দেখত পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীকে। এভাবে উৎপত্তি ও চরিত্রগত দিক থেকে একেপি সূফিবাদ ও নকশবন্দী-খালিদী ধারার হলেও মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী রাজনীতির বৈপ্লবিক প্রলেপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। বরং খালিদী ধারার আরব ও কুর্দী শেকড় ছিল একেপির আরও বৈপ্লবিক ধারা, বিশেষ করে হামাস, সিরিয়া ও মিশরের প্রতি এর পররাষ্ট্রনীতি থেকে এটির প্রমাণ পাওয়া যায়।

একেপি-গুলেন জোটের উত্থান ও পতন

এরদোগানের শাসনকালে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে গুলেন আন্দোলন সবচেয়ে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। গুলেন আন্দোলন রাজনীতি থেকে দূরে থাকত এবং এরবাকানকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু ১৯৭০ এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত এ আন্দোলন আমলাতন্ত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুসারী প্রবেশ করিয়েছে এ কারণে নয় যে, এ আন্দোলনের অনুসারীরা উচ্চমানের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা লাভ করেছে, যেমনটি অন্যান্য ধারাগুলোর ক্ষেত্রে ঘটেছে। বিশেষ করে এ আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি লোক ছিল বিচারবিভাগ ও পুলিশে। ২০০2 সালের নির্বাচনে গুলেন আন্দোলন একেপি-কে সমর্থন দেয়, যদিও একেপির সাথে তারা দূরত্ব বজায় রেখে চলত। ২০০৭ সালের পর গুলেন আন্দোলন রাজনীতিতে তৎপর হয়, যখন একেপির সাথে তুর্কি সেনাবাহিনীর বিরোধের ঘটনা ঘটে। একেপি ও ফেতুল্লাহ গুলেনের অনুসারীদের মধ্যে একটি অনানুষ্ঠানিক জোট এ সময় দৃঢ়তর হয়। কারণ ১৯৯৭ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর শুরু হওয়া নির্যাতনের কারণে সেনাবাহিনী ও বিচারবিভাগের প্রতি গুলেন আন্দোলনের তীব্র ক্ষোভ ছিল। গুলেন আন্দোলন একেপির নেতৃত্বের সাথে একত্রে যাত্রা শুরু করে। তারা আমলাতন্ত্রে, বিশেষ করে বিচার বিভাগ ও পুলিশে তাদের সম্পদগুলো বিনিয়োগ শুরু করে, যাতে ধর্মনিরপেক্ষ অভিজাতদের উপর পালটা আক্রমণ করা যায়, যে ধর্মনিরপেক্ষ অভিজাতরা বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে একেপি দলটিকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল।

ফলে একেপি ও গুলেন আন্দোলন একসাথে এরগেনেকন ও বালিওজ মামলা পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে শত শত সামরিক কর্মকর্তা, আমলা, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদকে কারাগারে যেতে হয়। এখন দেখা যাচ্ছে, সরকারে গুলেন আন্দোলনের শত শত নয়, হাজার হাজার অনুসারী রয়েছে, যাদেরকে এ আন্দোলন একত্রিত করতে সক্ষম। গুলেন আন্দোলন এ সুযোগ ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর তার প্রভাব বিস্তার করেছে। ২০১০ সালের সাংবিধানিক গণভোটের পর বিচার বিভাগ ও পুলিশের উপর কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে তারা বিচারিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলোকে পুঁজি করতে সক্ষম হয়েছে। এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী এরদোগানের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার সাহসী চেষ্টার সাথে সাংঘর্ষিক। এরদোগান মনে করতেন তুরস্কের প্রয়োজন একটি সুপার-প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার, যাতে তিনি নিজেকে একজন নির্বাচিত সুলতানে পরিণত করতে পারেন। স্পষ্টতই এ পরিকল্পনায় তিনি গুলেন আন্দোলনকে অন্য দশটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতো একটি গোষ্ঠী হিসেবে দেখতেন, যাকে তিনি তার স্বার্থে ব্যবহার করতে

চাইতেন। কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল- গুলেন আন্দোলনের চিন্তা ছিল ভিন্নরকম। গুলেন আন্দোলনের প্রতিনিধিরা বললেন, তারা এরদোগানের অগণতান্ত্রিক অভিলাষের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। তারা যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণসহ এই বলে জবাব দিয়েছেন যে, কার্যকরভাবে সরকারি নীতির ওপর ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারাও রাষ্ট্রের মালিকানার অংশীদার হতে চান। আন্দোলনের বহু গণতান্ত্রিক অনুসারীদের জন্য উপরের ব্যাখ্যাটি নিঃসন্দেহে অনেক বেশি সত্য। কিন্তু এরগেনেকন ও বালিওজ মামলার বিচারে সংঘটিত অনিয়মগুলোর দিকে তাকালে এটি স্পষ্ট হয় যে, আমলাতন্ত্রে আন্দোলনের প্রতিনিধিরা গণতন্ত্রের চেয়ে ক্ষমতার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন।

এ উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। এটি শুরু হয়েছিল তখন, যখন হিজমেত আন্দোলনের সাথে যুক্ত প্রসিকিউটররা এরদোগানের ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজনদের একজন- তুর্কি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হাকান ফিদানকে বন্দী করার চেষ্টা করছিল। এ চ্যালেঞ্জের জবাবে এরদোগান পদ্ধতিগতভাবে অনেক কর্মকর্তাকে বদলি, পদচ্যুত ও বরখাস্ত করে আন্দোলনের প্রভাবকে নস্যাৎ করার চেষ্টায় নিয়োজিত হন। একইসাথে এরদোগান এ আন্দোলনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে, যখন হিজমেত সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটরগণ সরকারের চারজন মন্ত্রীকে বড় ধরনের দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন, তাদের বহু সাথী ও পরিবারের সদস্যদের গ্রেফতার করেন এবং এরদোগানের পরিবারের সদস্যদের উপর আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন এ দ্বন্দ্ব কুৎসিত রূপ লাভ করে। পরিণামে সরকার বিচার বিভাগে থাকা ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী শক্তির সাথে কৌশলগত ঐক্য গড়ার দিকে এগিয়ে যায়।

এরদোগান হিজমেতের কাছ থেকে এমন আক্রমণের আশা করেননি। তিনি দেশে-বিদেশে পালটা আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিলেন। মধ্য এশিয়া থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত বিশ্বনেতাদের তিনি বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে হিজমেত স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়া দরকার, যে স্কুলগুলো চালু করার জন্য মাত্র কিছুদিন আগেও তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশের ভেতর তিনি সেই সেনাবাহিনীর সাথে অসম্ভব ও অপবিত্র একটি জোট করলেন, মাত্র কিছুদিন আগেও হিজমেতের সাহায্যে যাদের তিনি অবমূল্যায়ন করেছিলেন। এ প্রক্রিয়ায় শত শত সাধারণ নাগরিক ও কর্মকর্তা মুক্তি পেলেন, যারা কিছুদিন আগে এরগেনেকন ও বালিওজ মামলায় কারাগারে গিয়েছিলেন। এরদোগান প্রকাশ্যে তার ভুল স্বীকার করেন এবং তুর্কি মিলিটারি একাডেমিতে দেওয়া একটি ভাষণে তিনি পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনীর কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু তিনি হিজমেতের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন- এ দাবিটি ছিল অসত্য, কারণ সামরিক এসটাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে পরিচালিত শুদ্ধি অভিযানে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ নিবন্ধ লেখার সময় ফেতুল্লাহ গুলেনের কয়েক ডজন অনুসারী বিশেষ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে দিন গুজরান করছেন, যে আদালত এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে।

ইসলামী রক্ষণশীল পরিবেশের ভেতরকার এ মারাত্মক দ্বন্দ্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এমন ঘটনা বিরল। সম্ভবত তুরস্কের ইসলামী গ্রুপগুলোর মধ্যকার এটাই সবচাইতে বড় লড়াই। ইসলামী গ্রুপগুলোর মধ্যকার প্রতিযোগিতা ইতোপূর্বে কখনই সম্পর্কের সম্পূর্ণ ভাঙ্গনের দিকে গড়ায়নি। আবার এটিও ঠিক

যে, ইসলামী গ্রুপগুলো দেশের ভেতর কখনও নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতাও ভোগ করেনি। এ সংগ্রামের প্রভাব আগামী কয়েক দশক ধরে অনুভূত হবে। তুরস্কের রাজনীতিকে বাইরে থেকে দেখলে একটি বিষয় নিশ্চিতভাবে মনে হয়: আজকের তুর্কী রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় ধর্মীয় বিভিন্ন ধারা ও গোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্কের মাধ্যমে।

আনুষ্ঠানিক ইসলামী প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার ইসলামীকরণ

এ প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অবমূল্যায়িত উপাদান ছিল- এরদোগান কর্তৃক তুরস্কের আনুষ্ঠানিক ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থার উপর ইসলামের প্রভাব নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা। তুরস্কের শাসকদলের উপর নকশবন্দী-খালিদী ধারার প্রভাবকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, এরদোগানের এ পদক্ষেপের অনেক বড় প্রভাব ছিল।

উসমানীয় খেলাফত বা খেলাফত-পরবর্তী প্রজাতান্ত্রিক যুগ উভয় সময়েই তুরস্ক সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয় ছিল ধর্মীয় বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। অটোম্যানদের সময় এ কাজ করত শাইখুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন উলেমারা। প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কে এ ভূমিকা পালন করত দিয়ানেত ইজরেলি বাসকানিলিগি বা ডিরেক্টরেট অব রিলিজিয়াস এফেয়ারস (ধর্ম বিষয়ক অধিদপ্তর)। যদিও তুরস্কে দিয়ানেত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে অতি সম্প্রতি, তবু বহু বছর ধরে এটি ধর্মীয় পরিমণ্ডল নিয়ন্ত্রণ করত। দিয়ানেত সমগ্র তুরস্ক জুড়ে সকল মসজিদের ইমাম নিয়োগ করত। শুক্রবারের জুমুআর নামাজের খুৎবার অনুমোদন দেওয়া হতো দিয়ানেত থেকে। কিন্তু, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, সমগ্র তুরস্কের সকল মসজিদে ইমাম নিয়োগ দেওয়ার মতো জনবল দিয়ানেতের ছিল না। আর তাছাড়া দিয়ানেতের ভেতর বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সামগ্রিকভাবে, দিয়ানেতের শ্রেণীবদ্ধ প্রকৃতি তুরস্কের ধর্মকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এবং রাষ্ট্র সবসময় এটি নিশ্চিত করত যে, ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো যেন দিয়ানেতের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে না পারে।

কিন্তু একেপি সরকারের সময় দিয়োনেতকে দ্রুত একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হলো। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ছিল এটির নাটকীয় প্রবৃদ্ধি। এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে দিয়ানেতের বাজেট চারগুণ বৃদ্ধি করা হয়। এর বাজেট বেড়ে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক নিয়োগ দেওয়া হলো। ফলে দিয়ানেত পরিণত হলো তুরস্ক সরকারের বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানগুলোর একটিতে। এমনকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাইতেও এর আকার বড় হয়ে গেল।
দিয়ানেতের বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে সরকারের আমলাতন্ত্রে থাকা এর কর্মীদের সংখ্যা একই অনুপাতে কমতে থাকে। ক্রমেই এটির জনবল নিয়োগ দেওয়া হতে থাকে ইমাম হাতিপ স্কুল (তুরস্কের বিভিন্ন মসজিদে ইমাম প্রেরণের জন্য ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) ও ধর্মতত্ত্ব অনুষদের স্নাতকদের মধ্য থেকে। স্বাভাবিকভাবেই এরা ছিল নকশবন্দী-খালিদী ধারা ও এর বিভিন্ন শাখার অনুসারী।

দিয়ানেতকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১০ সালে একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দিয়ানেত রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করত। কিন্তু আইন প্রণয়নে দিয়ানেতকে যুক্ত করার এরদোগানের প্রয়াসের জবাবে চেয়ারম্যান বলেছিলেন, 'আইন প্রণয়নে দিয়ানেতকে যুক্ত করা ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিপরীত।' ফলে এরদোগান তার নিজের নির্বাচিত প্রার্থী মেহমেত গোরমেজকে নিয়োগ দেন, যিনি একেপির ইচ্ছার প্রতি অনেক বেশি বিশ্বস্ত ছিলেন।
দিয়ানেতের আকার বাড়ার সাথে সাথে এর সামাজিক ভূমিকাও বাড়তে থাকে। ২০১১ সালে দিয়ানেত খাদ্য জাতীয় পণ্যের হালাল সার্টিফিকেট দেওয়ার কাজ শুরু করে। পরবর্তী বছর এটি টেলিভিশন স্টেশন চালু করে। দিয়ানেত এখন ফতওয়া দিচ্ছে। জনগণের চাহিদার আলোকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। দিয়ানেত একটি ফ্রি টেলিফোন হটলাইন চালু করেছে, যার মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন বিষয়ের ইসলামী সমাধান দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই দিন দিন দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে ফতওয়ার সংখ্যা। আইনগতভাবে দেখলে দিয়ানেতের জারি করা রায়ের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। এগুলো সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবী। অবশ্য রক্ষণশীল জনতার কাছে এগুলোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

ইমাম-হাতিপ স্কুলগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরাসরি রাষ্ট্রপতি এরদোগানের প্রভাবের অধীনে চলে এসেছে, যা তার পুত্র বিলাল পরিচালিত তুরস্কের যুব ও শিক্ষা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এ ফাউন্ডেশন অনুদান গ্রহণ করে (একটি সউদি উৎস থেকে ৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান লাভ করেছে) এবং শিক্ষাখাতে সরকারি মালিকানাধীন জমি লিজ নিতে ফাউন্ডেশনকে উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হতে দেখা যায়।

২০০২ সালে ৬৫ হাজার ছাত্র ইমাম-হাতিপ স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়েছিল, আজ এ সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। ছাত্রসংখ্যার এ নাটকীয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে ২০১০ ও ২০১২ সালের আইন পরিবর্তনের পর। একে একে বিপুল সংখ্যক ধর্মনিরপেক্ষ হাই স্কুল ও মাধ্যমিক স্কুলকে ইমাম-হাতিপ স্কুলে রূপান্তর করা সম্ভব হয়। ইতোমধ্যে ২০১২ সালের আইনি সংস্কারের পর ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচিতে বিপুল পরিমাণ ইসলামী বিষয়বস্তু যুক্ত করা হয়েছিল। পাঠ্যক্রমে ইসলামে ইতিহাস ও মহানবী মুহাম্মদ (সা) এর জীবনী যোগ করা হয়।

যদিও এসব ধর্মীয় কোর্সের কিছু এখনও বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক হিসেবে রয়ে গেছে, তবু এটি কল্পনা করা সহজ যে, পশ্চিম তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ অঞ্চলগুলোর বাইরে সহপাঠী ও স্কুল কর্মকর্তাদের চাপের কারণে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীই এ কোর্সগুলো নেওয়া থেকে বিরত থাকবে। এ ধর্মীয় পরিবর্তনগুলো আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক উভয় প্রকৃতির। আক্রমণাত্মক, কারণ এগুলোর লক্ষ্য হলো একেপির পক্ষে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা। রক্ষণাত্মক, কারণ এগুলো গুলেন আন্দোলনের স্কুলগুলির সংখ্যা কমানোর প্রচেষ্টার সাথে মিলে যায়। প্রকৃতপক্ষে এ সংস্কারের পেছনে এ উপলব্ধি কাজ করত যে, গুলেন আন্দোলনের স্কুলগুলি এমন উচ্চতর শিক্ষা এবং সক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তৈরি করত, যাদের এরদোগান এবং একেপির প্রতি আনুগত্য নেই।

একেপির অধীনে, অফিসিয়াল ইসলাম ও সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হয়েছে। মসজিদ থেকে শ্রেণীকক্ষ পর্যন্ত এ পরিবর্তনগুলি এরদোগান ও তার দলবলকে নতুন জীবনদর্শনের তুর্কি প্রজন্ম উপহার দিয়েছে। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে ও নতুন প্রশিক্ষিত ক্যাডারদের মাধ্যমে তুর্কি অফিসিয়াল ইসলাম ও এর শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে খালিদি জীবনদর্শন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তার উপর, একেপির অধীনে দিয়ানেত ক্রমবর্ধমান হারে রাজনৈতিক হয়ে উঠেছে। অসংখ্য মসজিদে, একেপি ও রাষ্ট্রপতি এরদোগানকে সমর্থন ও মহিমান্বিত করে ইমামগণ খুতবা পাঠ করতেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে সম্প্রতি শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচুর পরিমাণ ধর্মীয় বিষয়বস্তু যোগ করা হয়েছে, যার ফলে অনেক স্কুল ইমাম-হাতিপ স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। তুরস্কের মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী এখন এ ধরনের স্কুলে পড়াশোনা করে। তাদের শিক্ষা ও মসজিদের ইমামদের খুতবা ক্রমবর্ধমানভাবে নকশবন্দী-খালিদি ধারার মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত এবং রাজনৈতিকভাবে একেপির সাথে সংযুক্ত। ফলে এটি সুস্পষ্ট যে, আগামী কয়েক দশক ধরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এর গভীর প্রভাব থাকবে।

উপসংহার

একেপি গঠনের পর, প্রথমবারের মতো প্রায় সব ইসলামি ধারা ও গোষ্ঠী একটি একক দল- একেপিকে সমর্থন দিয়েছিল। এ দলের মূল নেতৃত্বের শেকড় ছিল মিল্লি গুরুস আন্দোলন, যা নিজেই নকশবন্দি-খালিদি ধারার ইসকান্দারপাশা শাখার সৃষ্টি। কিন্তু যেখানে মিল্লি গুরুস ঐতিহ্যের দলগুলোর অবস্থান ছিল এ ধারার কেন্দ্রে, সেখানে একেপি ক্রমশ সকল ধর্মীয় ধারা ও গোষ্ঠীর একটি জোটে পরিণত হয়েছে। দলের ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারপন্থী অংশগুলো, যাদের অনেকেই শুরুতে সুযোগের সন্ধানে দলে যোগ দিয়েছিল, অথবা সামরিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শত্রুতার কারণে একেপির সাথে একাত্ম হয়েছিল, তারা একসময় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দল থেকে ছিটকে পড়ছিল। যদিও একেপি ও গুলেন আন্দোলনের মধ্যে স্পষ্ট আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে, তবু তাদের মধ্যকার সংগ্রামকে আদর্শগত দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখলে ভুল হবে। তাদের প্রতিযোগিতা মূলত ছিল ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে।

ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের সাথে একেপির উত্থান সমান্তরালভাবে ঘটেছে। এরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট শূন্যতা এভাবে পূরণ হয়েছে। তবে পশ্চিমা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর বিপরীতে, এ গোষ্ঠীগুলোর পেছনে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক এজেন্ডা সক্রিয় ছিল। এরা সমাজকে তাদের নিজস্ব ভাবধারায় পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ধর্মনিরপেক্ষকরণের প্রচেষ্টা তুর্কি ইসলামে বিপরীত প্রভাব ফেলেছে। ধর্মনিরপেক্ষকরণের প্রচেষ্টার সমান্তরালে সমগ্র তুরস্ক জুড়ে নকশবন্দি-খালিদি ধারা ও এর শাখাগুলোর দ্রুত প্রসার ঘটেছে। ফলে

আরব ও কুর্দি ঐতিহ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ধর্মের ধারণা তুরস্কে এসে হাজির হয়েছে।

(সংক্ষেপিত)

সূত্রঃ The Naqshbandi-Khalidi Order and Political Islam in Turkey

স্ভান্তে ই. কর্নেল

স্ভান্তে ই. কর্নেল আমেরিকান ফরেন পলিসি কাউন্সিলের সেন্ট্রাল এশিয়া-ককেশাস ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং স্টকহোমের ইনস্টিটিউট ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পলিসির সহ-প্রতিষ্ঠাতা, পাশাপাশি তিনি জিনসার জেমান্ডার সেন্টার ফর ডিফেন্স অ্যান্ড স্ট্রাটেজির পলিসি এডভাইজর।